প্রবন্ধ

শিক্ষা বিস্তারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ

মুহাম্মদ মাহবুবুল আলম

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। মেরুদণ্ডহীন মানুষ যেমন দাঁড়াতে পারে না, ঠিক তেমনি শিক্ষা ব্যতীত কোন জাতি পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। মানুষের মধ্যে আল্লাহ প্রদত্ত যে গুণাবলী ও প্রতিভা সুপ্ত রয়েছে, তার বিকাশ ঘটে শিক্ষার মাধ্যমে। পবিত্র কোরআনের প্রথম কথাই হল 'পড়'। মানবজাতির উদ্দেশে এটিই হল আল্লাহর প্রথম নির্দেশ। যদি আমরা মানুষের আদি ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করি তবে দেখব যে, হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম কে সৃজন করার পর আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সর্বপ্রথম যা দান করেছিলেন তা-ও শিক্ষা। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর আবির্ভাবের প্রাক্কালে আরববাসী গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। আল্লাহ তায়ালা তাদের হেদায়াতের জন্য দু'টি ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন:

এক. প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর শুভাগমন হল।

দুই. পবিত্র কোরআন নাযিল হল।

পবিত্র কোরআনে এ সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে: 'আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য এসেছে একটি নূর ও একটি সুস্পষ্ট গ্রন্থ (৫:১৫)। এ আয়াতে নূর হলেন নবী কারিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম (সূত্র: তাফসীরে জালালাইন) এবং সুস্পষ্ট গ্রন্থ হল পবিত্র কোরআন। পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হাতে-কলমে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি প্রেরিত হয়েছেন বিশ্বমানবের জন্য মহান শিক্ষক রূপে। প্রকৃতপক্ষে তিনি যে মহান আদর্শের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আজ থেকে প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ বছর পূর্বে বিশ্বমানবতাকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং জ্ঞান-গরিমা, ন্যায়-নীতি ও সভ্যতা-সংস্কৃতির সর্বোত্তম আদর্শ মণ্ডিত এক মানবগোষ্ঠী গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার মধ্য দিয়েই প্রমাণ হয়েছিল তাঁর সেই আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব। হেরা পর্বতের গুহা থেকে আলোকচ্ছটা নিয়ে-যে মহান জ্যোতি ও অনুপ্রেরণায় তিনি তাঁর মিশন শুরু করেছিলেন, তাঁর প্রথম কথাই ছিল- 'পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃজন করেছেন'। (৯৬:০১) বস্তুত ইসলাম হচ্ছে আলোর ধর্ম, অন্ধকারের বিনাশ সাধন এবং শিক্ষার মহান ব্রতে মানবতার সার্বিক কল্যাণময়ী সত্তার উজ্জীবন ও উদ্বোধন। তাইতো আমরা দেখতে পাই ইসলামের কষ্ঠিপাথরের পরশে আরবের অসভ্য বর্বর জাতি পরিণত হলো সভ্যতার নিশান বরদার হিসেবে। আরবের বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মিতে তামাম দুনিয়া আলোকিত হলো এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হলেন সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ (উসওয়াতুন হাসানা) হিসেবে।

শিক্ষা বলতে কি বুঝায়?

শিক্ষা হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া, যা দ্বারা প্রতিটি মানুষকে জীবন যাত্রার কৌশল ও নৈপুণ্যের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তাঁর জীবনের মিশন ও কর্তব্য উপলব্ধির। অপর কথায়-শিক্ষা হচ্ছে মানসিক, শারীরিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণ। এর লক্ষ্য হচ্ছে সুশিক্ষিত ও মার্জিত পুরুষ ও নারী তৈরি করা, যারা আদর্শ মানুষ এবং রাষ্ট্রের সুযোগ্য নাগরিক রূপে তাঁদের কর্তব্য সাধন করতে সক্ষম হবে। শিক্ষার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য এটাই। যে কোন অর্থেই হোক বিষয়টি এরূপ দাঁড়াচ্ছে যে, শিক্ষা হচ্ছে একটি ব্যাপক প্রক্রিয়া এবং তা শিক্ষার্থীর সামগ্রিক জীবনকে প্রভাবিত করে। আর এ কারণে একটি জাতির জীবন শিক্ষার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। বিভিন্ন যুগের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদগণ হতে প্রাপ্ত অভিমতগুলো গভীর ভাবে অধ্যয়ন করলে এ কথার যথার্থ স্বীকৃতিই আমরা পাই।

ইসলামী শিক্ষার স্বরূপ:

শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য জীবনকে সুপথে পরিচালিত করা। মানবকে মানবতার ধর্মে দীক্ষাদানের জন্যই কোরআন ও হাদিসের অবতারণা এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাব। সুতরাং কোরআন ও হাদিসের আদেশ ও নিষেধাবলী বা অন্যূন দৈনন্দিন জীবন যাপন প্রণালীর ও উৎকর্ষ সাধনে যে আইন-কানুন অবগতির আবশ্যক, তা জ্ঞাত হওয়া ফরজ। কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়ার জন্যে কারো প্রতি বাধ্যবাধকতা নেই, কিন্তু সমাজে স্বল্প কয়েকজন লোক

বিভিন্ন শিক্ষায় অভিজ্ঞ থাকা আবশ্যক। শিক্ষাকে এভাবে দু'প্রকারে বিভক্ত করা যায়, যা সকলের জন্য নিত্য আবশ্যক (ফরযে আইন) এবং স্বল্প কয়েকজন লোক জানলেই যথেষ্ট (ফরযে কেফায়া)। মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষানুসারে এভাবে দৈনন্দিন জীবন যাপন প্রণালীর উন্নয়ন ব্যবস্থা করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। অন্যথায় মানুষ মহাপাপে প্রগাঢ় অন্ধকারে আবৃত হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,জ্ঞান তিন প্রকার- কোরআনের মীমাংসিত আয়াত, হযরতের নিত্য কার্যাবলী এবং ন্যায়সঙ্গত বিধান। এসব ব্যাতীত অন্যান্য জ্ঞান অতিরিক্ত। কোরআন, হাদিস ও ধর্ম বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়া অথবা সাহিত্য, দর্শন, ভূগোল, গণিত, জ্যামিতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা লাভ ফরযে কেফায়া। এগুলো সকলের উপর বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু কেউই মহানবীর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঘোষিত ঐ তিন প্রকারের জ্ঞানে পারদর্শী না হলে সকলকেই পাপের গুরুভার বহন করতে হবে। কোরআনে বলা হয়েছে- 'বিশ্বাসীদিগের সকলকেই যুদ্ধে বহির্গত হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। তবে তাঁদের মধ্য থেকে প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে একদল শরীয়ত বিশেষজ্ঞ হওয়ার জন্য এবং প্রত্যাবর্তনের পর তাঁদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করার জন্যে কেন বহির্গত হয় না'? (৯: ১২২) ঈমান, নামাজ, রোজা এবং এগুলোর রীতিনীতি সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া প্রত্যেক মুসলমানদের পক্ষে ফরয। যাকাত ও হজ্বের রীতিনীতি জ্ঞাত হওয়া কেবল ঐ লোকদের উপর ফরয যাদের সম্পর্কে এটা প্রযোজ্য। মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- 'যে ব্যক্তি শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে পরাভূত করার জন্যে অথবা নির্বোধ ব্যক্তিগণের সাথে তর্ক করার জন্য অথবা মানব মন আকর্ষণ করার জন্যে বিদ্যান্বেষণ করে, আল্লাহ তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবেন।

[আহমাদ ও আবু দাউদ, সূত্র: মিশকাত, পৃ:৩৪-৩৫]

বস্তুত ইসলামী শিক্ষা ব্যতীত জাতীয় জীবনে নবীন বসন্তের শুভ্র হাসি ফুটে উঠে না, উঠতে পারে না। ইসলামী শিক্ষা ব্যতীত মানুষ যতো শিক্ষাই অর্জন করুক না কেন পরকালে সবকিছুই অন্তঃসারশূন্য বলে প্রতীয়মান হবে।

শিক্ষা বিস্তারে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর আদর্শ নীতি

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মাত্র তেইশ বছরে মানব জাতির এক অপূর্ব জাগরণ এনে দিয়েছেন। যারা একদিন তাঁর প্রাণের শত্রু ছিল, তারাই তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করে ধন্য হয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে তাঁর শিক্ষানীতির বিরাট সাফল্য যে, তিনি সমগ্র বিশ্বে তাঁর মহান বাণী পৌছে দিয়েছেন। যারা পরস্পর শত্রু ছিল, তারাই তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করে আপন ভাইয়ে পরিণত হয়েছিল। যেখানে সর্বত্র রক্তক্ষয়ী সংঘাত, খুন-খারাবি অগ্নি দাবানলের ন্যায় জ্বলে উঠেছিল, সেখানে তাঁর শিক্ষার কারণেই শান্তি ও মীমাংসার ফুল ফুটেছিল। যে সমাজে প্রস্তর নির্মিত মূর্তিগুলোকে সেজদা করা হচ্ছিল, সেখানেই তাওহীদের পতাকা উড্ডীন করা হয়েছিল। এসবই রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মহান শিক্ষার ফলশ্রুতিস্বরূপ। মানব জাতির ইতিহাসে এটিই হল সর্বাধিক বিস্ময়কর ঘটনা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যে পন্থায় মানুষকে সত্যের শিক্ষা দিয়েছিলেন, তন্মধ্যে একটি হল মানুষের প্রতি দয়া-মায়া, তাদের কল্যাণ কামনা এবং তাঁর বিনম্র স্বভাব। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন এভাবে-''আল্লাহপাকের অনুগ্রহে (হে রাসূল!) আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয়ের অধিকারী হয়েছেন, আর যদি আপনি রূঢ় মেজাজ ও কঠিন হৃদয় বিশিষ্ট হতেন তাহলে এসব লোক আপনার চারিপাশ থেকে দূরে সরে যেত"। (৩: ১৫৯) এ কারণেই অন্যায়কারীকে দেখে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তার প্রতি রাগান্বিত হওয়ার স্থলে তার জন্য আক্ষেপ করতেন, তার জন্য তাঁর দয়া হত, সর্বদা তিনি এ বিষয়ে চিন্তা করতেন যে, কিভাবে এই পথভ্রষ্ট মানুষদের পথ-প্রদর্শন করবেন এবং তাদের সঠিকভাবে পরিচালিত করবেন। একবার জনৈক ব্যক্তি মসজিদে নববীতে দাঁড়িয়ে প্রশ্রাব করতে শুরু করল, সাহাবায়ে কেরাম তাকে ধমক দিতে উদ্যত হলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবাগণকে এ ব্যাপারে বারণ করলেন এবং ঐ ব্যক্তিকে কাছে ডেকে এনে অত্যন্ত বিনম্র ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন যে, এটি আল্লাহ পাকের ঘর, ইবাদতের স্থান, এ স্থানকে কোন অবস্থাতেই অপবিত্র করা যায় না। নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আদৌ তার প্রতি রাগ করলেন না। এরপর তিনি হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে আদেশ দিলেন যেন পানি ঢেলে ঐ স্থানটিকে পবিত্র করা হয়। এ ছিল নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষাদানের একটি পন্থা।

দ্বিতীয়ত প্রিয়নবী মানুষকে যে কাজের শিক্ষা প্রদান করতেন, তিনি নিজেও সে কাজ করতেন। অর্থাৎ তাঁর উপদেশ বা ওয়াজ-নসিহত শুধু মানুষের জন্য ছিলনা বরং নিজে এর উপর সর্বপ্রথম আমল করতেন। যেমন তিনি মানুষকে নামাজের শিক্ষা দিতেন। আর তার অবস্থা ছিল এই, মানুষ দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে কিন্তু তিনি আট ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতেন। (অর্থাৎ এশরাক, চাশত এবং তাহাজ্জুদসহ) তাহজ্জুদ অন্য মু'মিনের জন্য ওয়াজিব ছিলনা, কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য ওয়াজিব ছিল। প্রায় সমস্ত রাত তিনি দরবারে এলাহীতে দণ্ডায়মান থাকতেন। তাঁর কদম মোবারক ফুলে যেত। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মু'মিনগণকে জামাআতের সঙ্গে নামাজ আদায়ের শিক্ষা দিয়েছেন এবং নিজেও তা বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন। এমনকি তাঁর ওফাতের পূর্বমুহূর্তে তিনি দু'জনের কাঁধে ভর করে মসজিদে তাশরীফ নিয়ে গেছেন এবং জামাআতের সাথে নামাজ আদায় করেছেন। তিনি মানুষকে রোজাব্রত পালনের আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম রমজানের রোজা ব্যতীত প্রত্যেক মাসে তিনটি রোজা রাখতেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মানুষকে দান-খয়রাতের আদেশ দিয়েছেন, আর তিনি দানশীলতায় এত আগ্রহী ছিলেন যে, সমগ্র জীবনে কোন সাহায্য প্রার্থীকে বিমুখ করেননি।

বিশ্ব মানবতার শ্রেষ্ঠতম শিক্ষক

শিক্ষক এবং শিক্ষা শব্দ দু'টি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষকের মাধ্যমেই শিক্ষার প্রচার ও প্রসার ঘটে থাকে। মানব জাতির শিক্ষক মূলত মহান রাব্বুল আলামীন। প্রথমেই তিনি তাদেরকে তাঁর প্রতি আনুগত্য করার শিক্ষা দান করেন। সকল মানুষের আত্মাকে একসঙ্গে সৃজন করে মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি কি তোমাদের প্রভু নই? সকল আত্মা সমস্বরে বলে উঠলো হ্যাঁ; আপনিই আমাদের প্রভু'। (৭: ১৭২) হযরত আদম আলায়হিস্ সালামকে সকল বিষয় সম্পর্কে শিক্ষাদান করে মহান আল্লাহ তাঁকে দুনিয়াতে পাঠান। তিনি এবং বিবি হাওয়া আলায়হিস্ সালাম-এর মাধ্যমেই পৃথিবীতে মানব জাতির বংশ বিস্তার ঘটান। মানব বংশের সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তারই বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। আল্লাহরই ইচ্ছায় পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, রাসূল হিসেবে পৃথিবীতে পরিচিতি লাভ করেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষাদাতা স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। মহান আল্লাহ কলমের সাহায্যে (মাধ্যমে) মানুষের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু একমাত্র মহান আল্লাহর অতিশয় প্রিয়নবীকে সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ফেরেশতা জিব্রাইল আলায়হিস্ সালাম-এর মারফত মৌখিকভাবে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে প্রস্তুত (তৈরি) করেন। আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কোন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এমনকি স্কুল বা মক্তবে পাঠ গ্রহণ করেননি। তাহলে তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি ইঙ্গিত দিলেন কেমন করে? এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, তা হচ্ছে-'Derived knowledge' বা সংগৃহীত জ্ঞান। কিন্তু আমাদের নবীজির জ্ঞান ছিল 'Revealed knowledge' বা নাযিলকৃত জ্ঞান স্বয়ং আল্লাহই ছিলেন তাঁর শিক্ষক। এ কথার যথার্থতা প্রমাণে আল্লাহ পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেন-'শপথ নক্ষত্রের, যখন তা অস্তমিত হয়, তোমাদের সঙ্গী (হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বিভ্রান্ত নয় এবং বিপথগামী নয়, এবং তিনি নিজ ইচ্ছায় কোনো কথা বলেন না, ওহী যা তাঁর কাছে প্রত্যাদেশ হয়। তাঁকে শিক্ষা দেয় এক মহাশক্তিশালী সত্তা' (৫৩:১-৫)। তিনি (নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানে পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হয়ে জগতবাসীকে এমন শিক্ষাই দান করলেন যে, মরুবাসী বেদুইনগণ সোনার মানুষে পরিণত হয়েছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষা সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে-'তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে (রাসূলের জীবনীতে) সুন্দরতম আদর্শ রয়েছে'। (৩৩: ২১) তাঁর শিক্ষা ছিল নিঁখুত। তাঁর ব্যবহার ছিল নমনীয় এবং আচরণ ছিল উদার ও ভালোবাসাপূর্ণ। মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় বান্দা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জন্মগতভাবেই শিক্ষকসূলভ আচরণ দান করেছিলেন। তাইতো নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলেছেন-'নিশ্চয়ই আমি মু'আল্লিম (শিক্ষক) হিসেবে (দুনিয়াতে) প্রেরিত হয়েছি'। *(দারিমী)* আল্লাহ বলেন-'হে মানুষেরা! আমি তোমাদের নিকট তোমাদেরই মধ্যে হতে একজন রাসূল পাঠিয়েছি। যে তোমাদের নিকট আমার আয়াত

(কোরআন) পাঠ করে শুনায়, তোমাদের জীবন পরিশুদ্ধ করে, তোমাদের কিতাব ও হিকমত (কোরআন ও বিজ্ঞান) শিক্ষা দেয় এবং তোমরা যে বিষয়ে কিছুই জানতে না, সেটা শিক্ষা দেয়'। (২: ১৫১) আল্লাহ যেখানে নিজেই নবীজিকে শিক্ষা দিয়েছেন, সেখানে নবীজির উক্তিগুলো যে বিজ্ঞানসম্মত হবে তাতে আর সন্দেহ কোথায়? নবীজি যেসব কাজ করতে বলেছেন এবং যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন সেগুলো একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বুঝা যায়, সেগুলো সত্যিই বিজ্ঞানসম্মত।

মূলত মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম একজন বিশ্বসেরা শিক্ষক ছিলেন। এবং মহান আল্লাহই তাঁকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক বানিয়ে ছিলেন, তাঁর শিক্ষাকে মানুষ অতি সহজেই গ্রহণ করতে বাধ্য হত এবং তাঁর পদতলে এসে আনুগত্য স্বীকার করে ইসলামে দীক্ষিত হত। তিনি নিজে শিখতেন এবং পরে অন্যকে সেই জ্ঞান শিক্ষাদান করতেন, ফলে সেই শিক্ষা সহজেই কার্যকরী হত।

শিক্ষা সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

বিদ্যা আলো এবং মূর্খতা অন্ধকার। আলো ও আধার সম্পূর্ণ বিপরীত; অর্থাৎ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের তারতম্য অনেক। কোরআনে আল্লাহ বলেন-'আধার ও আলো কি সমান? তোমরা কি চিন্তা করোনা? আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম ঐ ব্যক্তিগণ, যারা মূক, বধির এবং নির্বোধ' (৮:২২) আল্লাহ আরো বলেন-'বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান'? (৩৯:০৯) সুতরাং মহানবীর শিক্ষানুযায়ী অশিক্ষিত লোকদের স্থান নিম্নশ্রেণীর প্রাণী হতেও নিকৃষ্টতর; অপরপক্ষে শিক্ষিত লোকের পদমর্যাদা অতিউচ্চ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন হাদিসে বলেছেন।

ক. "দু'জন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো পদ গৌরব ও লোভনীয় নহে-ধনাঢ্য ব্যক্তি যাকে মহান আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং তা সৎপথে ব্যয় করার জন্যে ক্ষমতা দিয়েছেন এবং ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ জ্ঞান দান করেছেন এবং সে ঐ অনুসারে কার্য করে ও তা' শিক্ষা দেয়"।

[বুখারী ও মুসলিম শরীফ, ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সূত্রে বর্ণিত]

খ. "যখন কোন লোকের মৃত্যু হয়, তিনটি কার্য ব্যতীত অন্যান্য কার্য তার জন্যে বন্ধ হয়ে যায়। ঐ তিনটি বিষয় হলো: সাদকায়ে জারিয়া, যে ইলম (জ্ঞান) দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় এবং মঙ্গল প্রার্থনাকারী সন্তান"

[তিরমিজী, ১ম খন্ড: পৃ: ১৬৫]

গ. "যে ব্যাক্তি জ্ঞানান্বেষণে ভ্রমণ করে আল্লাহ তার বেহেশতের পথ সহজ করে দেন"।

[আবু দাউদ ও তিরমিজী, সূত্র-মিশকাত, পৃ: ৩৪]

ঘ. "আল্লাহ যার মঙ্গল কামনা করেন তাকে দ্বীনের ব্যুৎপত্তি (জ্ঞান) দান করেন। বস্তুত আমি বন্টনকারী এবং দাতা হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা"।

[বুখারী ও মুসলিম শরীফ, সূত্র-মিশকাত, পৃ: ৩২]

ঙ. "জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রতিটি মুসলমানদের উপর ফরজ"। [ইবনে মাজাহ, সূত্র-মিশকাত, পৃ: ৩৪]

চ. "ইলম (জ্ঞান) শিক্ষাদানে দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে তোমরা পরস্পরে উপদেশ দেবে। কেননা সম্পদের খিয়ানতের তুলনায় ইলমের খিয়ানত মারাত্মক দোষণীয় বিষয়। কিয়ামতের দিন আল্লাহ এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন"। *[রিয়াদুস সুন্নাহ (কবীর) পৃ: ৫০]*

মূলত কোরআন, হাদীস ও অন্যান্য সকল বিষয় জ্ঞানার্জনের জন্যই রাসূল তাগিদ করেছেন। বিজ্ঞান শিক্ষা করাও মহানবীর তাগিদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ বিজ্ঞান যেরূপ জড় জগতের সত্য আবিস্কার করে, ধর্ম সেইরূপ আধ্যাত্মিক জগতের চির সত্যের অনুসন্ধান করে। দুটি পরস্পর বিরোধী নহে বরং একই মতের সমর্থক। এই জন্যই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তার অনুবর্তীগণকে বিজ্ঞানে জ্ঞানোপার্জনের জন্যে বিশেষ নির্দেশ রেখে গিয়েছেন। উপরিউক্ত কোরআন ও হাদিসের বাক্যাবলীর ভিতর থেকে এটা স্পষ্ট প্রতিয়মান যে, হযরত সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিদ্যাশিক্ষার প্রতি কিরূপ তাকিদ দিয়ে গেছেন।

নারী শিক্ষার বিস্তার ও মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নারীকে যে গুরুত্ব ও মর্যাদা দান করেছেন তা আকাশের দিগন্তে তারকারাজির মাঝে একটি অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো ভাস্বর হয়ে থাকবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নারীকে যে অধিকার প্রদান করেছেন তা অতীত ও বর্তমানের কোন ব্যক্তি, আইন, জীবন পদ্ধতি দান করতে পারেনি। মহানবীর আবির্ভাবই হয়েছে মানুষের মাঝে ন্যায় নীতির ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা ও প্রত্যেক হকদারকে

তার প্রদত্ত হক প্রদানের জন্যে। পুরুষের জন্যে যেমন কিছু অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে নারীর জন্যেও আছে কিছু অধিকার। সমাজের অর্ধেক বা তার বেশী হচ্ছে নারী। রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দেখলেন, জাহিলী সমাজ নারীর প্রতি চরম অবজ্ঞা, জুলুম ও অন্যায় উৎপীড়ন করছে এবং তার প্রতি ঘৃণা ও অপমানের বান নিক্ষেপ করছে। এমনকি জাহেলী সমাজ নারীদের মধ্যে অমঙ্গলের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করতো, তারা বলতো-তিনটি জিনিসের মধ্যে অমঙ্গল নিহিত রয়েছে: নারী, বাহনের পশু ও গৃহ। জাহেলী সমাজে নারীর যে অবস্থা বিদ্যমান ছিল তা বর্ণণা করে বিজ্ঞ খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আল্লাহর কসম! আমরা জাহেলিয়াতের মধ্যে ডুবেছিলাম। কোন ব্যাপারেই নারীদেরকে গুরুত্ব দিতাম না। অবশেষে আল্লাহ তাদের সম্পর্কে যা নাজিল করার তা নাজিল করলেন, আর তাদের জন্যে যা বন্টন করার তা বন্টন করলেন। ঐ অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ এরশাদ করেন-"আর যখন তাদের কারো কন্যা সন্তান ভুমিষ্ট হওয়ার সু-সংবাদ দেওয়া হয় তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায়; আর সে তখন ক্রোধের রক্ত পান করতে থাকে। এই খারাপ খবরের পর লজ্জায় লোকদের কাছ থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখে। সে চিন্তা করে যে লাঞ্ছনা সহ্য করে কন্যা সন্তানকে রেখে দেবে না, মাটিতে লুকিয়ে ফেলবে? দেখ, তারা কেমন খারাপ ফয়সালা করে থাকে" (১৬: ৫৮-৫৯) এই অত্যাচারী সমাজ লাঞ্ছিত নারীদের জীবন অন্ধকারের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করেছিল। সেখানে আল্লাহ তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে পাঠালেন যিনি, মেয়েদের প্রতি গুরুত্বারোপ করলেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের মর্যাদা সমুন্নত করলেন, মানুষকে তাদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার ও তাদের গুরুত্ব প্রদানের নির্দেশ দিলেন এবং কন্যাসন্তানের উত্তম তারবিয়াতের প্রতি উৎসাহ প্রদান করলেন। আর মুসলিম সমাজকে সেই বিরাট প্রতিদানের প্রতি আগ্রহী করে তুললেন, যা সেই ব্যক্তির মধ্যে প্রতিক্ষা করছে। যে কন্যাদের তারবিয়াতের প্রতি যত্নবান হয় এবং তাদের প্রতি সদাচরণ করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন-"যে ব্যক্তি দু'টি কন্যাসন্তানের বয়োপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত প্রতিপালন করবে, তিনি তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলো একত্র করে বললেন, কিয়ামতের দিন আমি এবং সে এরূপ কাছাকাছি থাকবো"। [মুসলিম, সূত্র-মিশকাত, পৃ: ৪২১]

মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পিতার অন্তরে কন্য সন্তানের প্রতি গভীর মমত্ববোধ জাগ্রত করার উদ্দেশে বহু উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন-" যে তিনটি কন্যা সন্তান অথবা তিন বোন প্রতিপালন করলো, তাদেরকে শিষ্টাচারিতা শিক্ষা দিল এবং তাদের প্রতি দয়া করলো, অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে মুখাপেক্ষীহীন করে দিলেন। তাহলে তার জন্য আল্লাহ জান্নাত অবধারিত করে দেবেন। তখন জনৈক সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! দু'টি কন্যা প্রতিপালন করলেও? তিনি উত্তরে বললেন, দু'টি করলেও"। [শারহুস সুন্নাহ, সূত্র-মিশকাত, পৃ:৪২৩]

আর রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নারীর মর্যাদা উন্নতিকল্পে দৈনন্দিন কাজের মাধ্যমে এমন সব পন্থা ও পদ্ধতি অবলম্বন করতেন যাতে তা মানুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ঐ সকল কাজের মাধ্যমে তিনি মানুষকে উৎসাহিত করেছেন যেন তারা পুত্র-কন্যাদের তারবিয়াত দেন, তাদের চরিত্র গঠন করেন এবং আদব-লেহাজ, মহৎ কাজ, আহার-বিহার, পোষাক-পরিধান তথা সবকিছু শিক্ষাদানের ব্যপারে সমতা রক্ষা করে। এমনকি যে পিতা কন্যাদেরকে সুন্দররূপে তারবিয়াত দেয় এবং পুত্রদেরকে তাদের উপর প্রাধান্য না দেয়, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তার জন্যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি মানুষকে বক্তৃতা ও নসীহতের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ করে গড়ে তুলতেন এবং তাদেরকে এমন সব শিক্ষা দিতেন, যা তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ সাধন করতে পারে। একবার মহিলারা রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আবেদন করলেন যেন তিনি তাদের জন্যে একটা দিন ধার্য করেন, যেদিন তিনি তাদেরকে দ্বীনের তত্ত্ব এবং ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তা মঞ্জুর করেছিলেন এবং তাদের জন্যে একটি দিন ধার্য করে তাদের উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছিলেন, তাদেরকে নসীহত করেছিলেন এবং ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে কিছু তা'লীমও দিয়েছিলেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মুসলিম নারীদের অন্তরে জ্ঞানার্জনের তীব্র স্পৃহা সৃষ্টি করেছিলেন। এ শিক্ষা ফলপ্রসূ হয়েছিল এবং উত্তম ফল বহন করে এনেছিলো। যেমন-হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে ইসলামের প্রথম যুগের মহিলারা ব্যাপকভাবে সাড়া দিয়েছিল। ইবনে সা'দ তাঁর 'তাবাকাতে' সাতশত মহিলার

নাম উল্লেখ করেছেন, যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হতে বা তাঁর সাহাবীদের থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। আর ইবনে হাজার আসকালানী তাঁর *'আল-ইসাবাহ ফি তামায়িযিল হাদীস'* হাদীস গ্রন্থে এক হাজার পাঁচশত তেতাল্লিশজন মহিলা হাদীস বিশারদের নাম উল্লেখ করেছেন এবং তাদের পাণ্ডিত্য ও বিশ্বস্ততার ব্যপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন। ইসলামের ইতিহাসে আমরা এমন এক বিদূষী মহিলার সাক্ষাত পাই, ইতিহাস যাকে চিরস্বরণীয় করে রেখেছে। তিনি হলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা। তিনি লোকদের নিকট হাদীস বর্ণনা করতেন এবং সাহাবাদের বর্ণনা সংশোধন করতেন। এমনিভাবে বহু মুসলিম মহিলা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিরাট মর্যাদা অর্জন করেছিলেন।

শিক্ষা বিস্তারে মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বাস্তব পদক্ষেপ

মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের পূর্বে যেখানে সীমাহীন মূর্খতা বিরাজমান ছিল, সম্ভ্রান্ত পরিবারে লেখাপড়া দোষ হিসাবে বিবেচিত হতো। মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আগমনের পর প্রতিটি গৃহ ফিকহ, হাদীস ও তাফসীরের বিদ্যালয়ে পরিণত হয়ে গেল। এতদসত্তেও প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে ফিকহ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ ও শিক্ষাদানের উপযোগী সময় করে নেওয়া খুব কঠিন ছিল। এ কারণে প্রত্যেক দল ও গোত্রের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোককে মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দায়িত্ব দিলেন যাতে তারা শিক্ষাদান ও উপদেশ দানের কর্তব্য সম্পাদন করতে পারে।

মূলত এমন একটি দল সৃষ্টি করাই মহানবীর উদ্দেশ্য ছিল, যারা শুধু শরীয়তের আদেশ-নিষেধ সম্বন্ধেই জ্ঞাত হবেনা বরং দিবারাত্র তাঁর নিকট থেকে পুরোপুরি ইসলামী রঙে রঞ্জিত হয়ে যাবে, যাদের কথা-বার্তা, ক্রিয়া-কর্ম, উঠা-বসা তথা সমস্ত কিছুই হযরত সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর শিক্ষার আলোকে আলোকিত হবে-যাতে তারা সমগ্র দেশের জন্যে আদর্শ ও নমুনাস্বরূপ হতে পারে। হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত আছে-'আরবের প্রত্যেক গোত্রের একটি দল মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর নিকট যেতো এবং তার নিকট ধর্মীয় বিষয়াদি জিজ্ঞেস করে ধর্ম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করতো'। শিক্ষা ও উপদেশ দানের বিভিন্ন নিয়ম পদ্ধতি ছিল। এটি এই যে, দশ বিশদিন কিংবা এক মাস দু'মাস অবস্থান করে আকায়েদ ও অন্যান্য জরুরি মাস'আলা শিখে নিত। অতপর আপন গোত্রে প্রত্যাবর্তন করে তাদেরকে তা শিক্ষা দিত। উদাহরণস্বরূপ মালেক ইবনে হুয়াইরেস প্রতিনিধি দল নিয়ে আগমন করে বিশদিন অবস্থান করলেন এবং জরুরি মাস'আলা শিখে নিলেন। অন্য পদ্ধতি পাঠদান। এটা ছিল স্থায়ী। অর্থাৎ মুসলমানগন স্থায়ীভাবে মদিনায় বাস করতেন এবং চরিত্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতেন। তাদের জন্যে 'সুফ্‌ফা' নামক বিশেষ পাঠাগার ছিল। এতে বেশীরভাগ ঐ সব মুসলমান অবস্থান করতেন, যারা যাবতীয় পার্থিব ক্রিয়া-কর্ম হতে মুক্ত হয়ে দিবারাত্র ইবাদত ও জ্ঞানার্জনে মগ্ন থাকতেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শিক্ষক ও শিক্ষার প্রতি যে অনুরাগী ছিলেন এবং শিক্ষকদের মূল্যায়ন করতেন এর প্রমাণ নিম্নে বর্ণিত হাদীস থেকে আমরা পাই। নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম একদা মসজিদে গেলেন। মসজিদে তখন দু'টি মজলিস চলছিল: একটি হচ্ছে যিকিরের মজলিস অন্যটি পাঠদানের। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পাঠদান তথা জ্ঞান চর্চার মজলিসটিতে বসলেন এবং মন্তব্য করলেন যে, আমাকে শিক্ষকরূপে প্রেরণ করা হয়েছে। *(মিশকাত, কিতাবুল ইলম পর্ব)* শিক্ষা বিস্তারে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বাস্তব পদক্ষেপের এক জ্বলন্ত উদাহরণ হলো, বদরের যুদ্ধে যুদ্ধাহত বন্দীদের মুক্তিপণ নির্ধারণে। দ্বিতীয় হিজরীর ১৭ রমজান শুক্রবার বদরের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। এ যুদ্ধে পরাজিত ৭০ জন কাফিরকে বন্দী করে মদিনায় আনা হয়। এ বন্দীদের প্রত্যেকের মুক্তিপণ হিসাবে অর্থ জরিমানার নিয়ম ছিলো। কিন্তু প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এতটা বিচক্ষণ ছিলেন যে, তিনি ঘোষণা দিলেন, 'বন্দীদের মধ্যে যারা শিক্ষিত, তারা প্রতিজনে ১০জন করে নিরক্ষরকে শিক্ষাদান করতে পারলে বন্দী জীবন থেকে মুক্তি পাবে। তিনি এতটা শিক্ষানুরাগী ছিলেন যে, মদিনায় মসজিদে নববীর একাংশ ইবাদতের জন্য নির্ধারিত রেখে বাকী অংশের কিছুটা প্রশাসনের জন্য এবং অন্য অংশকে শিক্ষার জন্য মাদরাসা হিসাবে ব্যবহার করেন। এই ঐতিহাসিক মাদরাসা 'সুফ্‌ফা' নামে পরিচিত ছিল। তিনি ব্যক্তিগতভাবে এই সুফ্‌ফাটি দেখাশুনা করতেন এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সাইদ আল আ'স রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে এখানকার শিক্ষক নিযুক্ত করলেন। এই সুফ্‌ফাটি অবৈতনিক ছিলো এবং এখানে সর্বপ্রকার লেখাপড়ার ব্যবস্থা ছিলো। *'মসনদে ইমাম আহমদ ইবনে*

হাম্বলে' বলা হয়েছে: হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন-সুফ্ফা শিক্ষার্থীদের মধ্য হতে ৭০ জন রাত্রিবেলায় জনৈক শিক্ষকের কাছে যেতেন এবং সকাল পর্যন্ত শিক্ষালাভে মশগুল থাকতেন। (৩য় খন্ড, পৃ:১৩৭)

বস্তুত সাহাবায়ে কেরাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে যে শিক্ষাই লাভ করতেন সঙ্গে সঙ্গে তার উপর আমল শুরু করতেন। এটি ছিল প্রিয়নবীর শিক্ষার বৈশিষ্ট এবং সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ। রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- '(এহসান হলো) তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, যেন তুমি তাকে দেখছো। আর তুমি আল্লাহকে দেখতে না পেলেও তিনি তোমাকে দেখছেন' *(মুসলিম শরীফ, সূত্র-মিশকাত পৃ:১১)* মহানবীর আগমনের পূর্বে আরবে লেখার প্রচলন ছিলনা বললেই চলে। তখন অল্প পরিসরে প্রস্তরখন্ড, কাঠ ও গাছের ছাল বা পাতায় লিপিবদ্ধ করে রাখা হতো। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আগমনের সাথে সাথে যেন লিখন পদ্ধতিও নিয়ে আসলেন। তখন কোরআন মজিদকে লিপিবদ্ধ ও সুসংহত করার প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক। প্রথম দিকে কোরআনের সাথে হাদীসের সংমিশ্রণের আশংকায় তা নিষেধ করা হয়েছিলো। কিন্তু পরবর্তীতে সংমিশ্রণের আশংকা দুরীভূত হওয়ায় লেখার মাধ্যমে কোরআন ও হাদীস প্রচার ও প্রসারে নতুন মাত্রা যোগ হলো। এটা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কিভাবে শিক্ষা বিস্তারের কাজকে তরান্বিত করেছিলেন এবং অশিক্ষিত লোকদেরকে শিক্ষাদানের বাস্তব পদক্ষেপকে সফল করে তুলেছিলেন।

মোটকথা, মানব সমাজে জ্ঞান ও শিক্ষার বিস্তারে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শকে এক কথায় 'Mile stone' হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিদ্যা শিক্ষাকে ফরজ করে দিয়ে ক্ষান্ত হননি, তিনি এর জন্য গ্রহণ করেছিলে অসংখ্য বাস্তবমুখী পদক্ষেপ। ইদানিং বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবিদগন যে সমস্যা নিয়ে দিনরাত কাজ করছেন, কমিশনের পর কমিশন ও শিক্ষানীতি গ্রহণ করে শিক্ষাব্যবস্থাকে বাস্তবমুখী করার যে প্রানান্তকর শ্রম সাধনা করে চলেছেন মূলত মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রায় সাড়ে ১৪শ বছর পূর্বেই তা করে দেখিয়েছেন। যে সমাজে নারীর সামান্যতম মর্যাদাও স্বীকৃত ছিল না, ছিল না তার বাঁচার অধিকার টুকুও, সেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই জ্ঞানার্জনকে বাধ্যতামূলক করে শিক্ষার মহান আদর্শকে সর্বজনীনভাবে প্রসারিত করে দিয়েছেন। তিনি যেমন ছিলেন জ্ঞানের সম্রাট, তেমনি ছিলেন শিক্ষার আদর্শ প্রচার ও প্রসারে নিবেদিত বিশ্বমানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ দিশারী। তিনি সর্বকালের চিরন্তন আদর্শ। এ জন্যই পবিত্র কোরআনে তাঁকে বলা হয়েছে 'সিরাজুম মুনিরা' অর্থাৎ প্রদীপ্ত দীপ শিখা।

লেখক : প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
নোয়াখালী সরকারি কলেজ, নোয়াখালী ও এম.ফিল গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।